স্মৃতি ও স্বপ্নের দ্বৈত

(একটি প্রত্যুত্তরী- কাব্যলিপি প্রকল্পে রচিত পরিবিষয়ী পাঠবস্তু)

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

‘ভালো করে দেখুন, এই যে এই পিয়ানোটা, পুরোনো, আমার দাদামশাইয়ের আমলের, রিডের কোয়ালিটি যা রয়েছে, এখনও ...’ ফ্রেঞ্চকাট কাকাবাবুটি বললেন,

সুরের প্রতিটা কণা একেবারে স্ফটিকের মতো
গড়াতে থাকে,
ডালা খোলা পিয়ানোর আশপাশ থেকে,
মেঝেতে, লাল সিমেন্টের বর্ডারে, মোজেইকের চৌখুপিতে; রঙে রঙে বিন্যাস, বিন্যাসের অনবরত বদল, কেওস, র‍্যানডম প্যাটার্নের...

দাদামশাই, আমার মগজের মধ্যে প্রতিটি নাম এবং যত নামের কার্ড থরে থরে সাজানো, তার সাথে দাদামশাইয়ের মিল নেই, ফ্রেঞ্চকাট কাকাবাবুটির মগজের কোষের কার্ডে থাকবে, নিশ্চিত। নামের ঠিক কতোগুলো কার্ডের পর আর কোনো নাম স্মৃতিতে আঁটবে না? নাকী নতুন নামের পর পুরোনোরা ক্রমাগত ডিলিট হতে থাকে? চৌখুপির ওপরে ওপরে নিঃশব্দে ছবির পর ছবি জমা হতে থাকে।

ঠাকুরদা, আর তার বাবা আর তার বাবা আর তার বাবা আর তার বাবা অবধি নামের *মালা আমার গাঁথা* হয়ে আছে। আর মুখহীন, অবয়বহীন, পেতলের সিংহের পাশে নাকচোখমুখহীন সিঁদুরলেপা শ্রীশ্রীশ্রীরামচন্দ্রের সিঁদূর-লেপা-ভক্তমুখ।

কাকাবাবু, ফ্রেঞ্চকাট, অল্প করে হাসলেন, কলপ করে, লুঙির ওপর একটা দামি টিশার্ট পরে এলেন। ‘এই আমার সিংহাসন। আমার বাবা, আমার ঠাকুরদা মানে আমার দাদামশাই বসতেন, কখনো, এই প্রাসাদে।’ অনেক উঁচু ছাদ, দেওয়ানি খাসের খাস কামরার মাঝে সিংহাসন। আমায় ঝোলা থেকে ক্যামেরা বার করতে দেখেই, জিভ কেটে, দশ বাই ছয় ঘরের ছোট্ট দরজাটা খুলে ধরলেন। ‘এইদিকে ...। ইয়ে এই সিন্থেসাইজারটা নতুন কিনেছি, ওই নীচে যে ক্লাসরুমটা দেখলেন, ওখানে রিহার্সাল হয়।’ যেদিন যেদিন মহড়া হয়, সেদিন সেদিন শাহানশা আসেন। সিংহাসন বসানো হয়। আপনি আসবেন জানলে, জাঁহাপনা, ঠিক ঝেড়েপুঁচে সাফ সুতরো করে রাখতুম। ছি ছি ছি ছি কী ব্যাপার বলুন দেকি!’

> ঠিক কী লিখতে যাচ্ছি, এই আমি, শান্তনু, স্মৃতির ভেতর যে স্ফটিকের বল গড়িয়ে দেওয়া হল, তার যাত্রাপথ।

স্মৃতিলেখা (আর্যনীল মুখোপাধ্যায় প্রণীত)
এ লেখাটার আরো একটা নাম হতে পারে

উদ্বুদ্ধলিপি

আপনারা ভেবে সেটা বাতিল করতে পারেন। শেষ অবধি এটা একটা আন্তর্বুননলব্ধ পাঠবস্তু। পরিবিষয়ী কবিতাও বলতে পারেন, আবার নাও পারেন, পরিবিষয়ী পাঠবস্তুও বলা যেতে পারে। সময় ও স্থান এবং অবলোকনকারীর ভঙ্গীর ওপর পাঠ্যবস্তুর আকার ও আচরণ প্রকাশ হতে থাকবে।

যেকথা বলছিলাম, *তাহলে কোথায় থাকে স্মৃতি? কেমন তার ব্যবহার? (পৃঃ ১)*
স্মৃতি আসলে কল্পনার মতোই। যেন গোটা চাক জুড়ে সমবেত এক শীতঘুমে চলে যাওয়া শব্দ। (পৃঃ ১৪)

চাক ভেঙে শুধু মোম পাওয়া গেল,
শব্দের পাতালে খেলাঘর, রান্নাবাড়ির উঠোন, রান্নার বাসনকোসন,
এখন রক্ত ধীরে থেমে আসে, ধীরে ধীরে, শব্দের যাবতীয় গঠন কৌশল,
ভেবে ভেবে ভেবে ভেবে, শেষকালে একলার উঠোনে এসে থেমে যায় শব্দের চাকা,
ঠান্ডায় জমে ক্রমে বরফ হয়ে থাকে, থেকে যায় গোটা শীতকাল।

আর কাকে যেন ভালোবেসে আঘাত পেয়ে যে শেষে..... "কাকে যেন, কাকে যেন" কিছুতেই মনে পড়ে না তার নাম। কিছুতেই

আবার অনেকে নাম মনে রাখতে পারে না। সেটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছলে তাকে আমরা বলি অ্যানোমিক অ্যাফেসিয়া (anomic aphasia)। নাম মনে থাকুক না থাকুক আমরা সব কিছুরই নাম দিয়েছি। এ জগৎ বিশেষ্যের। (পৃঃ ১৯)

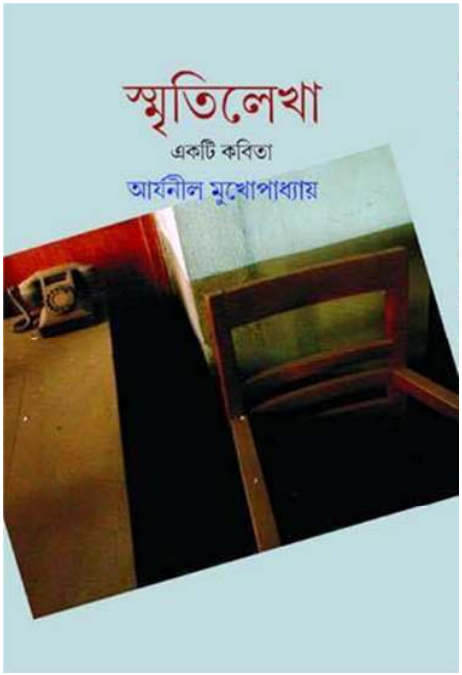

অন্ধকারে ফুনেস একটানা কথা বলে যাচ্ছিল –

আমায় বলেছিল ১৮৮৬ সালে ও মৌলিক একটি গননাপদ্ধতি তৈরি করেছিল আর সেই নিয়মে কয়েকদিনের মধ্যেই ও চব্বিশ হাজার পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু এর কোনোটাই ও লিখে রাখেনি কারণ ও যা কিছু একবার মাত্র ভেবেছে তা ওর পক্ষে ভোলা সম্ভব ছিল না। আমার বিশ্বাস তেত্রিশজন উরুগুয়ান বলার জন্য একটি সংখ্যা আর একটি পদের পরিবর্তে দুটি সংখ্যা [স্প্যানিশ ভাষায় তেত্রিশঃ treinta *(তিরিশ)* y *(ও)* tres *(তিন)] ও তিনটি পদ ব্যবহার করা নিয়ে ওর আপত্তি ছিল বলেই ও নতুন গননাপদ্ধতি তৈরি করেছিল। পরে অন্য সংখ্যার জন্য ও এই পাগলাটে নিয়ম প্রয়োগ করে। যেমন সাত হাজার তেরো না বলে ও বলত ম্যাক্সিমো পেরেজ, সাত হাজার চোদ্দর জন্য রেলপথ, অন্য সংখ্যাগুলির জন্য ছিল লুই মেলিয়ান লাফিনুর, অলিমার, গন্ধক, বেত, তিমি, গ্যাস, কড়াই, নেপোলিয়ন, অগাস্তিন দে ভেদিয়া । পাঁচশোর বদলে ও বলত নয়। প্রতিটি শব্দের সাথে একটি বিশেষ সংকেত যুক্ত ছিল। সংকেতটির কাজ ছিল চিহ্নিত করা। পরের সংখ্যাগুলো ছিল অত্যন্ত জটিল* .....(Funes le memerioso: Jeorge Luis Borges অনুবাদঃ ঋত্বিক)

জোনাকির নাম দেওয়া যাক আলোগান,
আলোগান থাকে *মোম জোছনায়,* জোছনা নিভে এলে
আকাশের এপার ওপার জুড়ে স্পষ্ট ছায়াপথ।
আকাশের অন্য অন্য দিকে অস্পষ্ট আরো আরো ছায়াপথ
চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অসংখ্য নক্ষত্রের সাক্ষাৎ।

ভেবে দেখুন, এই নদী একসময় কতোটা হৃষ্টপুষ্ট ছিল, চৈতন্যদেব গেছিলেন, তবে না বৈষ্ণবঘাটা, দেউলের বাড়ি, আর কত প্রত্নবস্তু, ছড়ানো ছেটানো, *মইদা,* জাহাজের প্রেত, তবে না জঙ্গল এলো, তবে না শীর্ণ স্রোত শীর্ণ থেকে শীর্ণতর, আর ঢেকে গেল সবুজে সবুজ *নীলিমায় নীল*। শালতি করে এই তো সেদিন ভিড় ভাড়াক্কা এড়াতে পুজোর সময় বাবু বাড়ি ফিরলেন আদি গঙ্গার স্রোতে চাংড়িপোতা। আজ সব প্রেতভূমি, গঙ্গার ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো জুড়ে জুড়ে প্রত্ন তীরভূমি।

ভিড় আমার সব ওলটপালট করে দেয়। ফাঁকা রাস্তায় কবন্ধরা
দোলাছায়া মরা পাতার পসরায় থেকে থেকে কার স্বগতোক্তি
একটা কখন উড়ে গিয়ে খালি বেঞ্চে কার বসার জায়গা
বাতিদান ও তার দ্বৈত। এর পায়ের পাশে ও। হাতে অচেনা হাত লাগছে
তিন বছর আগেকার লেখায় ভরে উঠছে
এই পঙক্তি। বাংলার বিলের ভেতর দিয়ে ভিনভাষা চলে যায়।
নৌকো উলটে আসে অননুবাদ
মরা মাছ ভেসে ওঠে জীবিতের অনেক ওপরে
আসে ইঁদুরকল। (পৃঃ ২৩)

কেননা পিশাচের কোনো ভাষা নেই। আর প্রত্নজীবেরও। ভাষা আছে, ভাষা নেই, ভাষা আছে, ভাষা নেই। রাম দুই তিন চার গুনতে গুনতে এসে থমকে দাঁড়ায় ভাষা। কাঁটা স্থির হয়। পাথরের গায়ে, প্রত্ন জীবাশ্মের গায়ে, স্তরে স্তরে ঘনিয়ে ওঠে শব্দের ঘোর। সেখান থেকে খুঁটে খুঁটে শব্দের গুণপনা জড়ো করা হয়।

ফি রোব্বার দুকুরে সকলে জড়ো হলে শুরু হয় ভাষা বানানোর রিহার্সাল, বুঝলেন! ওই আমাদের নীচের ঘরটায়, যেখানে দেকলেন, সার সার বেঞ্চি পাতা। অন্যদিন যেদিন রিহার্সাল থাকে না, ক্লাস হয়, কোচিংক্লাস। ভাষা শেখবার। ওখান থেকেই যাবতীয় সিম্ফনি, *গ্যাব্রিয়েল ওবো*, মারফতি।

ধার করা ক্যামেরার এতো স্মৃতি কম, চার পাঁচটা ছবি তুলতেই তার দম শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর আমাকে ছুটে ছুটে যেতে হচ্ছে প্লাগ সকেটের কাছে। হল কি যেদিন বাড়ি ছেড়ে দেবার পালা, তার আগেরদিন, আমি গেলাম, আর্যনীল বিদেশে; বাড়িটা তার নাড়িতে টের পেয়ে গেল, পেয়ে গিয়েই 'রানা রানা' বলে ডাক। ফোনে সেটা আমাকে বলাতে আমি রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে ওবাড়িতে গিয়ে স্মৃতি তৈরি করতে থাকলাম, একটা একটা ছবি তুলে। আর্যনীল আমায় বলে দেয়নি কিছু; বাড়িটা, আমি ঢুকতেই আমাকেই বানিয়ে নিল রানার ক্লোন আর আমি একটানা রাস্তার এপার ওপার বাড়ির আনাচে কানাচে, ছাতে, সিঁড়ির দোরগোড়ায়...একটানা দৌড়োতে দৌড়োতে হাঁফাতে হাঁফাতে সন্ধ্যা নামলে বাড়ি থেকে বেরোতে আমার ঘোর কেটে গেল; রাস্তার কজন আমায় ধরাধরি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল;

এসব স্মৃতি কি সত্যি, না আমি এই মুহূর্তে তাকে তৈরি করছি?

এইসব জালবোনার মুখ্য উদ্দেশ্যই তাই
জ্যামিতি ছ'কে ছ'কে জুড়ে ত্রিকোণ জুড়ে চতুষ্কোণ
গোপন রচনার মনোভঙ্গী ক'রে
তরমুজের ভেতরটা যে রাঙা সেটা বোঝানো (পৃঃ ৩২)

স্মৃতির ভেতর একটা আস্ত রেললাইন পাতা। শীতকাল, শরতের মেঘ, প্যান্ডেলের শুরুর কাঠামো। এবং বোলপুরের খাঁ খাঁ রোদ্দুর। ভারতবর্ষে চালু হওয়া প্রথম ই-মেল। রেললাইন বরাবর টেলিগ্রাফের তার। তখনও শোঁ শোঁ শব্দ হত। পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে সহজে সেসব শব্দ অনুবাদ করে নেওয়া যেত। একা একা অজয়ের চরে নেমে খোসা ছাড়িয়ে অজয়ের তিরতিরে জলে ভাসিয়ে দিতে পারা যেত। বহুদিন পর গঙ্গার স্রোতে ভেসে আহিরিটোলার কাছে একদলা কচুরিপানার ভিড়ে তাদের কুড়িয়ে এনেছিল বাগবাজারের পালেদের ছেলেরা। কুমোরটুলি হয়ে গোটা কলকাতায় ছড়িয়ে পরে তারপর।

কখনো এসব স্মৃতির সাথে কথা হয়নি আর
কখনো কথা হয়নি এসব স্মৃতির
শুধু পাশ দিয়ে যেতে যেতে বন্ধ দরজা জানালার বাড়িটিকে দেখিয়ে বলেছি,
ওই আমার বন্ধুর বাড়ি,
আর ওইপাশে ব্রহ্মপুত্র নদ। আমি দেখিনি কখনো। কাছে গেছি, তার গন্ধের স্মৃতি আছে।
তবু দেখিনি কখনো ব্রহ্মপুত্রের চওড়া। *সলিলবাবু* দেখেছেন।

ছোটোবেলা থেকে দেখে দেখে অর্কেস্ট্রায় তাকে একের পর এক তুলে নিয়েছেন

কার পিয়ানো জানি না। মানে কার কম্পোজিশন। কে বাজাচ্ছে জানি না। অর্ভিল গ্রাভিনের প্রসঙ্গ এসময় এসে পড়া স্বাভাবিক। এখন তার বয়েস হবে ৯৭।(পৃঃ ৩৭)

বয়েসে সে ঢের বড়ো। উনিশ শতাব্দীর শেষের দিকে। তবু তার বয়েসটা আটকে রইল চল্লিশের কোঠায়। কেননা সে কাগজে লেখা এক চরিত্র। স্মৃতির পাতায় লেখা নাম, স্মৃতির পাতায় পাতায় যেসব নামেদের লেখা, অথবা ছবি, তাদের বয়েস অমনি থমকে থাকে, পৃথিবীর সময়ের মাত্রা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। সময় শুধু চক্রাকারে ঘুরতে থাকে, প্রতিবার একইরকমভাবে, যতবার পড়া হবে, সময়টা সেই লুপে ঘুরতে থাকবে; প্রিয় মিস্টার হোমস, কীভাবে এর বাইরে যাবেন আপনি! একই সমাধান, বারবার প্রতিটা পাঠে। প্রিয় পাঠক, খেয়াল রাখবেন, এই পাঠবস্তু, যেটা এখন আপনি পড়ছেন, আপনার ইচ্ছাধীন। আপনি চাইলে সময়ের প্রতিটা মাত্রা যোগ হবে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে, এবং প্রত্যেকবার পড়বার সময়। এই লিখিত পাঠবস্তুটির স্থান কাল দুইই বদলে দিতে পারেন আপনি। পাঠক, আসলে আপনিই এর নিয়ন্ত্রক, আপনার মস্তিষ্কের কোষে এর প্রতিবার নতুন প্রকাশ ঘটে। আমি শুধু তার ইন্ধনগুলো একত্র করে রাখছি। তো যেকথা বলছিলাম, হোমস, উনবিংশ শতাব্দী থেকে আজ অবধি একই রকম; লন্ডনের বদল ঘটে গেল কতবার, আশ্চর্য *লাল গোলকধাঁধা* বদলে বদলে গেল কতবার! তবু আপনি...যাকগে, স্মৃতির ভেতর একটা কালো টুপির পাশে পাইপের ধোঁয়া উড়তে থাকে। ধোঁয়া নানারকম প্যাটার্ন তৈরিতে সক্ষম। মেডালা অবলঙ্গাটায় তার প্রতিটি প্যাটার্ন বিশ্লেষণের ব্যবস্থা আছে।

লক্ষ করবেন চেম্বারে ঢুকেই কিন্তু আমি কোটটা খুলে
চেয়ারে টাঙিয়ে রেখেছি
ভেবেছি বল্কল খুলে গাছ তার গোপন দরজা দেখায়।(পৃঃ ৩৮)

স্থায়ী রকম কোনো মীমাংসার সূত্র পাওয়া যাচ্ছে না
মীমাংসার স্থায়ী কোনোরকম সূত্র পাওয়া যাচ্ছে না
মীমাংসার কোনো রকম স্থায়ী সূত্র পাওয়া যাচ্ছে না
প্রশ্নের উত্তরে বেছে নিতে হয় একখানিই।
তিনটি সম্ভাব্য উত্তর। তিনটিই সঠিক এবং তিনটিই ভুল।
এতটাই গতিশীলতার মধ্যে উত্তর চলাচল করে।
আমাদের পরীক্ষা শুরুর ঘন্টা পড়ে, শেষের কোনো ঘন্টা বা ঘোষণা নেই।
উত্তর নির্বাচন করা মাত্রই শেষ।
নতুন প্রশ্নপত্র এসে পড়ে আবার।

অন্ধকারে একা একা বসে থাকার অভ্যাস তৈরি হয়। জানলার পাল্লায় তক্তা মারা হয়। পেরেক চুঁইয়ে জ্যোৎস্না নেমে আসে, গড়িয়ে জমা হয় নীচে বটগাছের তলায় বসা মুচিটির জুতোর ক্রিমে। চকচক করে ওঠে পালিশের জুতোগুলো। ভিড় হয় আশেপাশে। মুচি একলা কাজ করে, হাঁটু তুলে ঘাড় গুঁজে। একলার পৃথিবীর ঘেরাটোপে।

অন্ধকারে একা একা বসে থাকার অভ্যাস তৈরি হয়। উল্টোদিকের বন্ধ দোকানের সামনে অন্ধ ভিখারি, সারা গায়ে নিয়নের পালক লেগে; চকচক করে ওঠে সামনের রুমালে পড়া ধাতব পয়সাগুলো। ফুটপাথের পাথরে লেগে লেগে ঠং আওয়াজ হয়। ভিখারির আশেপাশে পায়ের ভিড় সরে সরে যায়। ফুটপাথের গোড়া থেকে মা গঙ্গা ভকভক করে বেরোতে থাকে জোয়ারের টানে।

অন্ধকারে একা একা বসে থাকার অভ্যাস তৈরি হয়। লম্বা টানা সোফার নীচে, হাত পা আলতো গুটিয়ে, দিন রাত শীত গ্রীষ্ম। এখন স্মৃতি গন্ধের কণায় ধরা থাকে, গন্ধের কণারা অজস্র, অসীম, অসংখ্য; তাদের প্রতিটা আলাদা আলাদা করে আমার এই ছোট্ট লম্বাটে মাথার ভেতরে কী করে ধরা থাকে আমি জানিনা, আমার মাও জানত না, মার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি জন্মের পর থেকেই, কে জানে আমার মা কোথায়, তার কোনো গন্ধ-কণা আমার স্মৃতিতে আছে কি? দৃশ্যের সাথে গন্ধ-কণা মেলাই, মিলে গেলে এক পাক ঘুরে নিই, গলা দিয়ে ব্যক্তিগত আওয়াজ বার করি, নতুন ভাষার জাল বুনি।

পরিবিষয়ী কবিতার কমুনিকেশন কেমন হবে
এই ভাবছিলাম কদিন
হয়তো তাই ট্রেন এল
সংকুচিত গোলার্ধে মিশে যায় দেশান্তরের স্টেশনবাড়ি (পৃঃ৫৭)

এসো জঙ্গলের এই আঁধারে পথ খুঁজে নেওয়া যাক।
আমাদের কোনো কৌম স্মৃতি নেই।
ড্রাইভারের আছে, সে স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের বংশধর।
জঙ্গলে রাত নেমে এলে কালো *জাগুয়ারের* মতো তার মাথার দুপাশে সবুজ চুনি জ্বলে।
অন্ধকারের জঙ্গলে সাদাটে রাস্তা হাসনুহানার গন্ধের কণা ছড়ায় বাইরে নিয়ে যাবে বলে,
সে শুঁকে দেখে, মুখ উঁচু করে, ফের তুলা-পায়ে হেঁটে চলে,
ধুলোর ওপর তার চারখানি থাবার টায়ারের দাগ বসে যায়।
ভেতরে গুম হয়ে, কাঠ হয়ে, অন্ধকারে একা একা বসে থাকার অভ্যাস তৈরি হয়।

অতীতের অর্থের ওপর গোটা সন্ধের
কুয়াশা (পৃঃ ৬০)

গুহাচিত্রের স্মৃতির কী হবে? প্রাচীন বাকলের নীচে উইয়ের সার্কিট ডায়াগ্রামগুলির? পাথুরে দেয়ালে বিচিত্র প্রাণীদের চেনা চেনা ঠেকে, অথচ পাতলা একটা সর পড়ে থাকে তার প্রকাশের ওপর। তীরন্দাজদের তির, শিকারীদের বল্লম, যূথবদ্ধ মানুষের পাথরের সমস্ত হাতিয়ার, সবকিছুর ওপর একটা পাতলা সর। অর্থের খোঁজে দেয়াল থেকে দেয়ালে ফিরছে বর্তমান। বাক্সের ভেতর গুটিয়ে রাখছে জেলখানা। দেশলাই বাক্সে কয়েদি। অর্থ জমতে জমতে একসময় উপছে পড়ে গবেষণাগার। তখন সব ফেলে আবার নতুন করে শুরু

করতে হয়। এসব কি সত্যি ছিল ডক্টর বিষ্ণু শ্রীধর? না এসব ছবি আসলে ওদের কল্পনা, স্মৃতি থকে আঁকা? তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? স্মৃতির ভেতর স্মৃতির ভেতর স্মৃতির ভেতর স্মৃতির ভেতর .....∞

একটা বৃহৎ আয়না, একটিই স্মৃতির মাঝে দুটি সমান্তরাল প্রতিফলক দাঁড় করানো
আর কেবলই স্মৃতির জন্ম হয়

সে টুকরো টুকরো লিখছে। পায়রার শরীর হৃদপিন্ড নিয়ে 'পালোমা' শব্দটা নিয়ে ভাবছে...(পৃঃ ৭২)
স্মৃতির ভেতর হালকা একটা পাখনা মেলা ভাসা। আর এক রাতে *উনা পালোমা ব্লাংকা* অনুবাদ করে ফেলা, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা গাইবে বলে। এই লেখা লেখবার সময় ঝাঁ করে মনে পড়ে গেল, আর তন্নতন্ন করে গোটা বাড়ি খুঁজেও সে অনুবাদ ফিরে পাওয়া গেল না; বাড়ির গহিনে সে যে সেই ঘাপটি মেরে রইল, তাকে সেখান থেকে টেনে বার করে আনা অসম্ভব(!) হয়ে রইল। 'অসম্ভব' শব্দটিতে একটা বিস্ময়সূচক দেখে নিশ্চিত কিছু মনে হচ্ছে আপনার, অজস্র সম্ভাবনা তৈরী হচ্ছে ওই চিহ্নটার। হোক, তবু জানাতে চাইছি অসম্ভব শব্দটা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আপেক্ষিকভাবে সত্যি। কাল পরশু তরশু এর চরিত্রের বদল ঘটে যেতে পারে। অবশ্য তখন আপনিই বা কোথায় আর আমিই।

বাড়ির ভেতর ঢুকে স্মৃতি এখন নিজেকে প্লাস্টিসিনের মন্ড ভাবে
আপনাকে ভেঙে গড়ে আবার এই বাড়ি (পৃঃ ৮২)

অ্যালবামের কালো পাতায় কালো কর্নার।
ফ্ল্যাগ থেকে পাখনার মতো একটা শিস বেরিয়ে এসেছে সাদা কালো ছবির ওপরে।
ওইই ওইই সা লাগলো
আমাদের রানা না? দ্যাখো কত্তোটুকু, পুরীর সমুদ্রের হাওয়ায় চুল উড়ছে,
ফেনার ধাক্কায় খুলে যাচ্ছে পায়ের চটি
ছুঁচোলো পাথরটার ওপর আবার কে দুধের বাটি ফেলে গেল!
যে জিনিসটা না দেখব, একটা না একটা.....
কই দেখি দেখি, হ্যাঁ অ্যাআ অ্যা এই তো মেজপিসিমার শ্বশুরবাড়ি, কখোনো যাননি শুনেছি,
এইখানে পিসেমশাইয়ের হাত ধরে দঁড়িয়ে আছেন।
মিস্টির দোকানের ছোঁড়াটা রোজ এসে নীচের ঘর থেকে চার্জ করে নিয়ে যেত,
ওর ছবিও আছে অ্যালবামে। আর ইতু-মিতুর।
ওদের বাড়িতে নমোশুদ্রদের বসার জায়গা ছিল বারান্দার বেঞ্চে,
ফলে ওদের কোনো ছবি নেই।
বাড়িটা সব মনে রেখেছে।
নতুন রঙ করার আগে পলেস্তারা খসানোর আগে বলতে চেয়েছিল।
গলা টিপে শাসানো হয়েছিল। আমরা তখন ছোটো, কিছু বলতে পারিনি।

So you're saying people know about your project already. How?

Everybody, if they are honest, believes in me. While many people have no faith in 'God', even the most redoubtable atheists know only too well that the devil is a different matter. My work is difficult to ignore, especially in everyday experience. I'm always there when things go wrong (unlike God, who is never there when you need him). That's why I don't need to prove my existence or justify it. To the sophisticated, of course, I'm just a concept, with no 'reference' outside of language, and who am I to disagree? I make no such ontological claims for myself. (An interview with Satan: Frank Dexter)

ভিড়ের ভেতর হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা ষোলোআনা জেনেও আমরা ভিড়ে পা দিই
বিশেষ করে পুজোর সময়ে,
অথচ হারানোর পরেও আবার দেখা হয় সক্কলের সাথে সক্কলের,
লিপ্তপদের সঙ্গে লিপ্তপদের
বৃহচ্চঞ্চুর সাথে বৃহচ্চঞ্চুর
একশৃঙ্গের সাথে একশৃঙ্গের
একটা গাঁঠরির মধ্যেই বাঁধা থাকে সব ঠেসেঠুসে, গিঁট খুলতেই টের পেয়ে যায় সব।
হারানো লুকোনো খুঁজে পাওয়ার মধ্যে যাবতীয় হুসহুস, সিঁড়ির তলা, আবছা শিরশির,
সমস্ত সিলভার ব্রোমাইডে ছেপে উঠতে থাকে এত দ্রুত যে অ্যাসিডিক স্টপ বাথ দিয়ে থামাতে হয়।
জল থেকে তুলে ক্লিপে ক্লিপে টাঙানো
মাইকেল! মাইকেল! (পৃঃ ১০৭)

প্রবীরদার সঙ্গে দেখা হল, রজতের বাড়ি। জিজ্ঞেস করলেন "ঘালো আছো তো?" আমি বললাম, "ভালো, তুমি?" প্রবীরদা বললেন "আঙি ঘালো আছি।" পুরোনো সোনোডাইনের কাঠের শাটার খুলে মাইকেল মুখ বের করে বলে, 'শুনছ, প্রবীর, তোমার কাজ শেষ হলে বোলো, আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি, যা গরম আর মশা এখানে, বাইরে ঘুমোনোর জো নেই।' প্রবীরদা ঘাড় নাড়তেই কাঠের শাটারটা বন্ধ হয়ে গেল। আর মাইকেলকে দেখা গেল না।

##
খানিক্ষণ অপেক্ষার পর "শঙ্কটা ধাম" এর বাইরে এসে ফুটপাথে বসি। বসে বসে যুগলসের ওপরে বাড়িটাকে দেখি। ওপারে রামকৃষ্ণ মেডিকেল স্টোরে যাই। সেখান থেকে দেখি। তারপরে এপাশে এসে বাড়িটার ছায়ায় দাঁড়াই। বাড়িটার খুব কৌতূক হয়। পাশের বাড়িকে ডেকে বলে, 'ড্যাকরাটাকে দ্যাখ! খালি ঘুর ঘুর ঘুর ঘুর, আজ সারাদিন দেকচি আমার পিছে লেগে আচে। মতলবখানা কী কে জানে, ওনাকে বলেছি, ডাঁয়ে বাঁয়ে করলে মুকে নুড়ো জ্বেলে দেবে।' আমি শুনতে পেলেও না শোনার ভান করেছি, আর কেবলই তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছি বাড়িটাকে। অথচ দেখতে পাইনি। কিছুতেই দেখতে পাইনি। ভেতর থেকে বাইরে থেকে জল থেকে আকাশ অন্তরীক্ষ থেকে কোনো জায়গা থেকেই আমি বাড়িটার আসল চেহারা দেখতে পাইনি। অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে ধরাধরি করে রাস্তার লোকেরা...সে তো আগেই বলেছি।

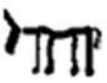

হ্যালুসিনেশন যাতে না হয় এই ভেবে আমি পরদিন অ্যান্টি হ্যালুসিনেশন ইঞ্জেকশন নিয়ে আবার যাই ওবাড়ি, গিয়ে দেখি এবারে কোত্থাও নেই বাড়িটা, বেমালুম উবে গেছে, যুগলসের ওপরে একটা নৃশংস শূন্যতা হা হা করছে। বিড়ম্বনার একশেষ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি। ছোটোবুড়ির সাথে দেখা। বাবলুদার বোন।

বাবলুদা, টুকুদির বর। টুকুদি, খুকুদির দিদি, খুকুদি আমার দাদার বৌ। টুকুদি সুন্দরী ছিল খুব, কিন্তু অশিক্ষিত, দেখে বোঝা যেত না। ছোটোবুড়ির একটা বড়ো বোন ছিল, বড়োবুড়ি। টুকুদির বিয়ের সময় চারদিন এসে আমাদের বাড়িতে ছিল। ওরাও খুব সুন্দরী ছিল। কোথায় বাড়ি, বেহালার ওদিকে না খিদিরপুরে কে জানে। ওরা খুব ভালো নাচত। আমরা হাঁ করে দেখতাম। নতুন বর বাবলুদা হিন্দি গানের সাথে বডি ঝাঁকিয়ে সে কী নাচ, বড়োবুড়ি কোমর থেকে বডিটা পেছনদিকে যতটা সম্ভব হেলিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে পারত, ছোটোবুড়িও। অত নমনীয়, ময়দার ডেলার মতো, আমরা সামনের সারিতে মেঝের ওপর বসে হাঁ করে দেখতাম। ব্যালান্স এত ভালো ছিল যে পড়ি পড়ি করেও মেঝের ওপর পড়ে যেত না। ছোটোবুড়ি বড়োবুড়ি একদিন চলে গেল, তারপর আর কখোনো দেখিনি। তারা আছে কোথাও। আবার তারা আশির দশকের সেই নাচের মধ্যেও আছে। অথচ দুটো অস্তিত্বের অনস্তিত্বের এরকম পাশাপাশি থাকা কোনো বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে না।

##
প্রতিটা শব্দের খোলসের ভেতর অর্থের পুর
প্রাচীন ভাষাতে চর্চা হয় অর্থের, পুর বদল ঘটে, কোনো শব্দ ফাঁকা পরে থাকে,
গুবরে পোকার পিঠে চড়ে কুপরিবাহী তার বেয়ে সেই খোলগুলি দ্রুত এসে পরে
ডাক্তারবাবুর বৈঠকখানায়। অমনি ডাক্তারবাবুর নাতি চেঁচায়,
‘টেলিফোন এসেছে’
কালো বেকেলাইটের টেলিফোন (পৃঃ ১২৫)

স্মৃতির ভেতর সকলের একটা ছাত থাকে, রেলিংঘেরা অথবা নেড়া,
সেই ছাত থেকে কিছু না কিছু আশ্চর্য, দূর থেকেই চোখে পড়ে,
সেই ছাত থেকে সত্যি সত্যি অথবা মিথ্যে মিথ্যে কেউ না কেউ
নির্ঘাৎ পড়ে যায়, গোপন সন্ধি হয় কারো সাথে,
ছাতের কোণায় পড়ে থাকে পায়াভাঙা টেবিল, কানাভাঙা টব আর অনেকটা ঘুড়ি-আকাশ।
আচমকা ছাতে উঠে এলে আকাশ ছোঁয়া যায়
ছাতের গোপন প্যাপিরাসে টুকে রাখা নাম বিবর্ণ হয়
মুছে যায় না। কখোনো না কখোনো তাদের ঠিক খুঁজে বার করে স্মৃতিভূক পাখিরা

অ্যালবামের অনেকটা চলে গেল সৎকার সমিতির গাড়িতে। (পৃঃ ১৫৬)

প্রিয়া সিনেমার আগুন তাহলে আজ নতুন নয়। প্রায়ই লেগেছে। আজ অথবা কাল বাদে পরশু। আনন্দবাজারের খোলা ছাত হয়ে সেকথা পৌঁছে গেছে বাড়ি বাড়ি পিছিয়ে পড়বার আগেই। জোকস অ্যাপার্ট, আগুন নিয়ে মাইরি বলছি ছেলেখেলা নয়। নীল হলুদ আগুনের শিখার ভেতর যাবতীয় জোরালো অঙ্কন। সিঁড়ির ওপর থেকে ছিটকে আসা দেহ অথবা আগুনের হলকা। একের পর এক। কোলাপসিবল বন্ধ হবার পর

সমস্ত পথও বন্ধ হতে পারে। দমকলের চোদ্দপুরুষের সাধ্য নেই আগুনের অনুমতি ছাড়া আগুন নেভানোর। শুকনো পাতার জঙ্গলের পাশ দিয়ে সার সার রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের বাড়িগুলো।

কেউ বলে স্মৃতি থাকে পাতার জঙ্গল পেরিয়ে পক্ষ্ম-এর নীচে। আসলে এই কানাচের এই মুহূর্তটাই সে যার দিকে দৃষ্টি গিয়েও যায় না। (পৃঃ ১৬১)

গভীর জঙ্গলের ভেতরে এক অলীক,
খয়েরি পাতা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বিছিয়ে আছে আর্কিয়ান পাথরের ওপর,
সেই ভূমি থেকে কবিতার জন্ম হয়।
হাড়ের বাঁশির ভেতর কৌম স্মৃতি জাগরুক থাকে।
নিয়ানডারথ্যালের পাশে বসে আজকের কবিতার পৃষ্ঠভূমি তৈরি হয়।
সহজ এক পরম্পরা। ধ্বনিগত সাদৃশ্য থেকে ত্রিমাত্রিক ছবি।
সেগুনের গ্রীষ্মকালীন পাতার ঘসটানি,
জঙধরা মৌচাকের শোঁ শোঁ,
বহু নীচে চলে যাওয়া নলকূপের জল, ঠন্ ঠন্ হাতলের একটানা।
অশরীরী হাওয়া ভোরবেলা স্নিগ্ধতার রূপ নেয়।

##
ঘড়ির দোকানে এক একটা স্মৃতির সূত্র টাঙানো
কাস্টমারের হাতে গাইগার কাউন্টার, যদিও ব্যবহার জানে না কেউ
দু একটা সময়ের দানা ছিটকে মেঝেয় পরে
ঝাঁট দিয়ে জড়ো করে রাখে দোকানি
পার্টসের আকাল, গুহামুখে জড়ো করা হাড়ের পাহাড়
ক্রমাগত ক্ষয়ে যাচ্ছে স্মৃতি
ক্ষয়ে আসছে নিদারুণ ভবিষ্যৎবাণী।
শব্দের আকার ইকার উকার সমস্ত স্বরবর্ণ খুলে পড়ে যাচ্ছে নীচে
কোনো যন্ত্রেই ধরা পড়ে না তার চিহ্ন
জীবনের উত্তেজনা তেজস্ক্রিয়তার সন্নিকটে এমন উত্তাল হয়ে ওঠে তার আয়ু যে দু-আধখানা হয়ে যাচ্ছে সেই খেয়াল নেই। (পৃঃ ১৬৮)

শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যায়
ভাকরার খাল থেকে বয়ে আসা জল
বিপদসীমার ওপরে বয়,
পদ্মার পাড় ভাঙে, নিহতের তালিকাতে যোগ বিয়োগ চলতেই থাকে
এসবই দুর্ঘটনা অথবা স্মৃতির বেহিসেব...
বন্ধ জুটমিলের পেল্লায় বাড়ির কেয়ারটেকার চাবি ফেলে দিয়ে মিলিয়ে যায় বাতাসে
নাচঘরে এস আকারের ডিভানে দশটা প্রেত উঠে নাচানাচি করে

সিসি টিভির নজর পড়ে থাকে বালুঘড়ির দিকে
মনে রাখা মেশিনের এ এক আশ্চর্য সহজাত ডেমো। (পৃঃ ১৮৮)

এই সমস্ত দরজার কতগুলো মিথ্যে?
কেবল মিথ্যে পার্সপেক্টিভ গড়ে তুলতে কতগুলো মিথ্যে দেয়াল? (পৃঃ ২০৩)
যেসব ঘটনা জড়িয়ে থাকে এক একটা জালে,
নানান অছিলায় যারা জুড়ে থাকে পুরোনো দালানে
তাদের কতটুকু মিথ্যে?
বাচ্চেওয়ালি তোপের কথাই ধরা যাক
কার কার গর্ভ খসে গেল, নবাবের হুকুমে
পদ্মার জল কতখানি ডেকে গেল আশপাশ দিয়ে,
কিংবা দলমাদল কামান, সামনেই রয়েছে
বিস্মৃতির ভেতরে কে তার গোলা ফাটিয়ে ছিল
ইতিহাস জুড়ে তার তেলকালি পুরাতত্ত্বের লোকেরা ভারা বেঁধে সাফ করেই চলেছে।
ও হ্যাঁ আসফউদ্দৌলা! নখের আঁচড়-লাগা ফাঁপা সিঁড়ি
ইমামবাড়ার লাগোয়া দেয়ালে। স্থাপত্যের ভেতর পুরোনো ঘূণ
ভুলভুলাইয়ার অদৃশ্য স্মৃতি হয়ে লেগে থাকে
ঘোড়ার নালে রেসিডেন্সির ধুলো ঝড়
মেমসায়েবের গাউন হয়ে উড়ে যায় কলকাতার ছাতের ওপর দিয়ে
এসব সত্যি মিথ্যের বাইরের ব্যাপার, মিহি বুনটের ঘেরে
কবিতাতে এসে জড়ো হচ্ছে,
যার কোনো পরম্পরা নেই, অনিবার ঢেউয়ের মতো রিদমিক অথচ অগোছলো হয়ে
এসে পড়ছে স্মৃতির ভেতর।

স্মৃতিও অধিবৃত্ত - এই তত্ত্বকে অবলম্বন করেই কুন্ডলীর ভাবনা।
এই পশ্চাৎ-দর্শনকে সামনে রেখেই আসল সময়ের কাঠামো
বয়ে শেষ হয়ে যাওয়া
বয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া লগিগুলো
ট্রেন দুর্ঘটনা থেকে ছিটকে পড়া সতীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জড়ো করে
ভাবী নতুন নন্দনাকে সাজায় (পৃঃ ২০৯)

থিসিস অ্যান্টিথিসিস সিন্থেসিস এই জীবনের সেরা সত্য।
প্রশ্ন কোরো না, প্রশ্নহীন আনুগত্য পৌঁছে দেবে চূড়ার সম্মানে।
নিজেকে প্রশ্ন করো, খুঁড়ে খুঁড়ে তোলো বেদনার বিন্যাস।
প্রশ্ন করো, তার পর প্রশ্ন করো, তার পরও প্রশ্নই করো।
প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শুধু প্রশ্ন করাই যদি ঐতিহ্য হত
এইভাবে প্রশ্নের পিরামিডের টঙে উঠে যদি

উলটে দেওয়া যেত ঘট
আর আমরা নীচের সমস্ত ইতর উপকৃত হতাম
সমানভাবে (পৃঃ ২২৪)
এবার কোন দর্শন গ্রহণ করবে তুমি!
স্মৃতির আনাচে কানাচে পড়ে থাকা ছাই জড়ো করে দেখো নীচে কিছু আগুন রয়ে গেছে কীনা!

##

একটা আন্তঃমিশ্রন ঘটে গেল পাঠবস্তুতে। ক্রমাগত, অনিয়ন্ত্রিত অথচ স্মৃতিরক্ষাকারী। প্রকৃত প্রস্তাবে স্মৃতি আসলে একটা রাসায়নিক উৎক্রম। কোনো ধ্বনি দৃশ্য স্পর্শ স্বাদ গন্ধ ভাব অভাব অজস্র স্নায়বিক রসায়নে অনুতে অনুতে বহু রকম প্যাটার্ন তৈরি করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা বদল ঘটে, সময়ের দূরত্বে তার তাপমাত্রা কমে বাড়ে। ভার্চুয়ালি এক ভৌত প্রকৃতি গঠন করতে থাকে, যাকে আমরা স্মৃতির ভেতর রাখা ধ্বনি দৃশ্য স্পর্শ স্বাদ গন্ধ ভাব অভাব বলে সম্মত হই। কখোনো আলাদা আলাদা রাসায়নিকের মধ্যে গঠনের সংযুক্তি অচেনা প্যাটার্নের জন্ম দেয়, যার সময়ের স্থানাঙ্কে কোথাও কোনো অস্তিত্ব নেই অথচ স্মৃতির মৌচাক জুড়ে অবলীলায় রয়েছে। দুটি স্নায়ুর মধ্যেকার আদানপ্রদানের মাঝে কণাবাহিত তথ্যের আঁচ কমে এলে অজানা রসায়ন তার দখল নিয়ে ফেলে, মেরামত করে, ফাটলের জায়গাগুলো নিপুনভাবে জুড়ে ফেলে, জোড়ের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। ঘর ভেঙে গেলে মালপত্র সব জড়ো করে নিয়ে ওঠা হয় অন্য ঘরে। মস্তিষ্কের একাংশ নিষ্ক্রিয় হলে স্মৃতির তরল গড়িয়ে গিয়ে জড়ো হয় অন্যত্র, সহজলভ্য কোষে। ডাঁই করে রাখা কণায় চাপা পড়ে থাকে পুরোনো স্মৃতি, হারায় না, শুধু বিবর্ণ হয়ে তার রাসায়নিক উপাদানের সান্দ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে মনে পড়ে না। স্মৃতি ও স্বপ্নের মধ্যে একটা ক্ষীণ চলাচল শুধু জারি থাকে।

প্রাথমিক সূত্রঃ স্মৃতিলেখা,একটি কবিতা / আর্যনীল মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩; প্রকাশক পত্রলেখা

Copyright © 2018 Santanu Bandopadhyay Published 31st Dec, 2018.

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৬৯। শিক্ষায় ভূতাত্ত্বিক, পেশা সরকারী ও নেশায় ঘোরতর এক পাহাড়ি। পর্বতকর্মিও বলা যায়। শান্তনুর লেখালিখির শুরুয়াত ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি। ‘কবিতা পাক্ষিক’ পত্রিকার সাথে দীর্ঘ সম্বন্ধ ওঁর। এক সময় সহ-সম্পাদনা করেছেন। নানাভাবে যুক্ত ‘কৌরব’ পত্রিকার সাথেও, এক যুগের ওপর। উত্তরাধুনিক সাহিত্য নিয়ে শান্তনুর চিন্তাভাবনা অনেক, লেখালিখিও রয়েছে। কৌরব ও কবিতা পাক্ষিক পত্রিকা ও জালিকায় অনেক পরীক্ষামূলক লেখ-প্রকল্প চালিয়েছেন। পরিবিষয়ী কবিতা আন্দলনের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। অনেক গদ্যও লেখেন নিয়মিত, নানা পত্রপত্রিকায়, মূলত পাহাড় ও ভ্রমণ বিষয়ে; পাশাপাশি ছোটোদের জন্য বইলেখা, বইপ্রকাশ, পর্বতারোহীদের নিয়ে নানা সৃষ্টিধর্মি কাজে শান্তনু নিয়ত নিয়োজিত।